

টেক্সটবুকের মেশিন লার্নিং:

টেক্সটবুকীয় ভার্সন কিন্তু কষ্টের। তবে, অনেকটাই বৈজ্ঞানিক।

মেশিন লার্নিং নিয়ে অনেক উদাহরণ দিয়েছি আগে। আজ টেক্সটবুক স্টাইলে কিছুটা ধারণা দেবার পালা। কথা দিচ্ছি জিনিসটাকে নিয়ে আসবো একদম পানির মতো করে। এটা ঠিক - আমরা যতই টেক্সটবুক মার্কা লেখা অপছন্দ করি না কেন - ঝামেলাপূর্ন জিনিস বুঝতে শেষমেশ আমাদেরকে ফিরতে হয় এই টেক্সটবুকে। এটা ঠিক যে টেক্সটবুক থেকে সরাসরি বোঝা দুষ্কর - তবে আমি চেষ্টা করব টেক্সটবুকটাকে কিভাবে আপনাদের কাছে ‘সহনীয়’ পর্যায়ে নিয়ে আসা যায়। আপনারা দেখেছেন পৃথিবীর প্রতিটা মেশিন লার্নিং সমস্যাগুলোকে আসলে “তিনটা” কনসেপ্টে ভাগ করা যায়। ঠিক ধরেছেন। মোটে তিনটা। আমি কথা দিচ্ছি আজকের এই মেশিন লার্নিং এর টেক্সটবুক ব্যাপারটাকে একদম সহজ করে নামিয়ে দেব আপনাদের সামনে।

ক. শুরুতেই আমাদেরকে শিখতে হবে কিভাবে একটা কাজ - ধরে নেই টাস্ক “T”কে সমাধান করতে হবে। আমাদের শেখা মানে মেশিনকে শেখানো। মনে আছে আগের উদাহরণটা কথা? মোবাইল অপারেটর “ক”তে কাজ করছেন আপনি। একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে দেয়া হলো আপনাকে। প্রশ্নটাই আমাদের কাজ “T”। প্রেডিক্ট করতে হবে সামনের মাসগুলোতে কোন কোন গ্রাহক ছেড়ে যাবে আপনাদেরকে? মানে আপনার কোম্পানি মোবাইল অপারেটর “ক” থেকে। এই প্রশ্নের উত্তর বের করতে হবে কাজ হিসেবে। আবারও বলছি - আমাদের কাজ হচ্ছে কোন কোন গ্রাহক আসলে “ক” থেকে অন্য অপারেটরে চলে যাবে সেটাকে ঠিকমতো বের করা।

খ. এখন এই কাজটা মেশিনকে শিখিয়ে নিতে অথবা আমাদের নিজেদের করতে কিছু ‘অভিজ্ঞতার’ প্রয়োজন। হটাৎ করে তো আর কেউ কিছু করতে পারে না। ভুল বলেছি? টেক্সটবুকের ভাষায় আমাদের এই দরকারি অভিজ্ঞতা অথবা “এক্সপেরিয়েন্স”কে আমরা “E” বলে ধরে নিচ্ছি। মোবাইল অপারেটরের এই সমস্যার সমাধান আমাদের খুঁজতে হবে কোম্পানির অভিজ্ঞতা থেকে। মোবাইল অপারেটরের কাছে “অভিজ্ঞতা” হিসেবে আছে গ্রাহকের সব ডাটা। যন্ত্রের আবার অভিজ্ঞতা কী? সত্যিই তাই - গ্রাহক সম্পর্কিত ডাটাসেট। গ্রাহকের বিভিন্ন সার্ভিসগুলোর ব্যবহারের ডাটা, কবে কি কি সার্ভিস অ্যাক্টিভেশন করেছেন, মোবাইল রিচার্জ ইত্যাদি তথ্য চলে আসবে ডাটাসেট হিসেবে।

সোজা কথায় আমাদের সমস্যার ওপর কাজ করতে হলে দরকার ‘অভিজ্ঞতা’ যেটা মোবাইল অপারেটরের কাছে আছে ডাটাসেট হিসেবে। সেই ডাটাসেট থেকে দেখা যাচ্ছে আগে কে কে এই মোবাইল অপারেটর থেকে চলে গিয়েছে। তার চলে যাওয়ার পেছনে কি কি ব্যাপারগুলো কাজ করেছে, সেগুলোকে ‘ম্যানুয়ালি’ বের করার ধারণাগুলো আমাদের জন্য একটা বড় অভিজ্ঞতা। আমাদের মতো মানুষই প্রথমে বের করে দিয়েছে কেন সে চলে গিয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে কে কে চলে যাবে তা আগে থেকেই ধারণা করতে পারবে এই মেশিন লার্নিং। বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। আবার বলি - ‘অভিজ্ঞতা’ হচ্ছে সেই সত্যিকারের পুরানো ডাটা যেখানে আমরা জানি কোন কোন কারনে একজন গ্রাহক চলে গেছেন মোবাইল অপারেটর “ক” ছেড়ে।

গ. এখন ‘অভিজ্ঞতা’ ‘E’ থেকে আমাদের “T” কাজের দক্ষতা কোথায় পৌঁছেছে সেটা জানতে আমাদের দরকার “পারফরম্যান্স” মানে “P”। আমরা আসলে কাজটাকে ঠিকমতো করতে পারছি কিনা অথবা কতোটুকু পারছি সেটা জানতেই এই দক্ষতার পরিমাপ। আমাদের মেলাতে হবে কতটুকু পারছি ঠিকমতো। সেখানে আমাদের নতুন কিছু যোগ করতে হবে কিনা? নতুন কিছু ‘মডিফিকেশন’ করলে আমাদের উত্তরগুলো ঠিক আসছে না আরো ভুল হচ্ছে সেটা বের করার জন্য দরকার আমাদের এই “P”। “ক” মোবাইল অপারেটরের কতো শতাংশ গ্রাহক আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে - সেটার কতটুকু ঠিকমত ধরতে পারছি সেটাই আমাদের দক্ষতা। আমাদের প্রশ্নের কতো শতাংশ ঠিকমতো কাজ করছে ওই সব গ্রাহককে আগে থেকে “ক্লাসিফাই” করার ব্যাপারে? “ক্লাসিফিকেশন” হচ্ছে দুভাগে। একজন গ্রাহক, উনি চলে যাবেন - নাকি যাবেন না। ধরে দিচ্ছি আমরা যদি ১০০ জন গ্রাহককে বের করতে পারি যারা চলে যাবেন অপারেটর ছেড়ে, সেখানে বাস্তবে যদি ৯০ জন চলে যান তাহলে আমরা বলতে পারি আমাদের দক্ষতা “P” হচ্ছে ৯০%।

কিছু ধারণা পরিষ্কার হলো তো আপনার? না হলে আবারো পড়তে পারেন এই ৩টা কনসেপ্ট। খুবই সোজা! হাতে এলো একটা প্রশ্ন/সমস্যা। কি করবেন?

১. সমস্যা/প্রশ্নের উত্তরে একটা কাজ মানে টাস্ক “T”কে সমাধান করতে হবে

২. কাজ “T”কে সমাধান করতে দরকার পুরানো অভিজ্ঞতা অথবা “এক্সপেরিয়েন্স” “E”

৩. কাজটা ঠিকমতো হচ্ছে কি না সেটা দেখতে দক্ষতা - “পারফরম্যান্স” মানে “P” এর ব্যবহার। দরকার হলে সেটাকে ‘মডিফাই’ করে কাজকে আরো ভালোভাবে উৎরানোর চেষ্টা করা

# অংকে মেশিন লার্নিং, ১:

The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man.

-- George Bernard Shaw

ছবি আর অংকে ডাইভ দেবার আগে আমাদের ছোটবেলার একটা গল্প বলি। গল্পটা সবার জন্য প্রযোজ্য। শুরুতে আমার নাম দিয়ে দিচ্ছি। নিজ দায়িত্বে নিজের নাম দিয়ে পড়ে নেবেন।

আপনার নিজের নামটা দেবার পেছনে অবশ্যই কারণ আছে। ব্যাপারটা নিয়ে ওনারশীপ তৈরি না হলে সামনে এগোনো কঠিন হবে।

ছোটবেলা থেকেই \_\_\_\_\_\_\_এর একটা অনুসন্ধিৎসু মন ছিল। আশেপাশের সব কিছু জানার চেষ্টা ছিল তার ভেতরে। আশেপাশের সবাই ভাবতো বড় হয়ে রকিব কিছু না কিছু করে ফেলবে। ভবিষ্যতে যে “ডাটা সাইন্টিস্ট” হিসেবে নতুন ধরনের একটা কাজ আসবে সেটা ওই সময়ে মাথায় ছিল না কারো। মনে রাখবেন, ব্যাপারটা অনেক আগের। ১৯৮০ সালের ঘটনা বলছি। তবে, বিজ্ঞজনেরা মনে করতেন এ ধরনের একটা কাজ আসবে সামনে। ভবিষ্যৎ বলতে পারার কাজ। তবে সেটা হাত দেখা বা টিয়াপাখির সাহায্য ছাড়াই।

ছোটবেলা থেকেই সে বিভিন্ন ধরনের প্যাটান বুঝতে পারত। যেমন, স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে কে কবে কবে ক্লাসে না আসতে পারে সেটার একটা ধারণা তৈরি করে ফেলেছিল এর মধ্যেই। আসলে কে কার ক্লাস ফাঁকি দিতে চায় সেখান থেকেই বলতে পারতো সে। আবার ক্লাস টিচারদের মধ্যে কে কে সামনের দিনগুলোতে ক্লাস মিস দিতে পারে সেটার একটা টেবিল তৈরি করে ফেলেছিল পেছনের ক্লাসগুলোর অনুপস্থিতি থেকে। ছোট্ট রকিবের এই ব্যাপারটা তার আত্মীয়দের মধ্যে জানা ছিল। সেবার আমপাকা গরমের ছুটিতে দাদা বাড়িতে বেড়াতে গেল সে। জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিলো ওই একটা ঘটনায়।

ছোট্ট রকিব তার ছোট ফুঁপিমাকে খুবই পছন্দ করতো। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন উনি। যেকোন ধরণের উপদেশ নিতে দাদার পাশাপাশি সবাই আসতো ছোট ফুঁপিমার কাছে। তবে, অল্প কথা বলতেন। হয়তোবা সেকারণেই মানুষ আকৃষ্ট হতো বেশি। আর ফুঁপিমার মতো রূপবতী একটা মানুষকে দেখেনি সে। গ্রামের বাড়িতে গেলে ছোট ফুঁপিমার কাছেই থাকতো ছোট্ট রকিব।

পিঁপড়ার লাইন দেখে বলে দিতেন কবে ধরে বৃষ্টি হবে। সকালে পুকুরের পানির থির থির দেখে বলতে পারতেন আজকে জাল ফেললে কেমন মাছ উঠবে। আরো কতো কিছু! সবচেয়ে বড় ব্যাপার - উনি অংকে জাহাঁবাজ ছিলেন। পুরো এলাকার মানুষ জানতেন তার এই অংকের কথা। কাগজ পেন্সিল সবসময় থাকে তাঁর কাছে। আলীগড়ে উনার অংক নিয়ে পড়তে যাবার কথা শুনছিলো এই ছুটিতে এসে। যাবার কথা প্রায় মোটামুটি ফাইনাল হয়ে আছে।

এক রাতের ঘটনা। খাবার শেষে সবাই বারান্দায় বসে গল্প করছে। সেদিন রাতে বেশ গরম পড়েছিলো বোধহয়। ছোট্ট রকিব একটু হাঁসফাঁস করছিলো বলে বাতাস করছিলো ছোট ফুঁপিমা।

রকিবের অবস্থা দেখে বড়ো চাচা নড়ে বসলেন। "টেম্পারেচার কতো হবে?" জিজ্ঞাসা করলেন উনি। তবে, কাউকে উদ্দেশ্য করে বলেননি উনি।

দাদার স্টাডি'তে ঝোলানো বড় একটা থার্মোমিটারের কথা মনে পড়লো রকিবের। বাঁ দিকের দেয়ালে লাগানো ছিলো তখন। স্প্রিংফিল্ড কোম্পানির। লাল রঙের তরল জিনিস ভেতরে। লাফ দিয়ে দাঁড়ালো রকিব।

"দেখে আসি থার্মোমিটার।" অন্ধকারে টর্চের দিকে হাত বাড়ালো সে।

ফুঁপিমা প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন। "হতচ্ছাড়া ছেলে। বসে বসে বাতাস খেতে ভালো লাগছে না, না?"

রকিবের আসলেই ফুঁপিমার বাতাস খেতে লজ্জা লাগছে। বলতেও পারছে না। আবার ফুঁপিমাকে কষ্ট দিতে চাচ্ছে না। সে এখান থেকে বেরোতে পারলে বাঁচে।

ফুঁপিমা আবারো বললেন, "তোকে উঠতে হবে না। এখানে বসেই বলতে পারবি তাপমাত্রা কতো। আসলে তোকে সবাই চেঁচামিচি করে টেম্পারেচারটা বলছে, তুই হয়তোবা বুঝতে পারছিস না।"

রকিব হাঁ হয়ে গেল। বলছেন কি ফুঁপিমা? ফালতু কথা বলার নন উনি। সবাই চুপ হয়ে গেল। শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনেক কষ্টে মুখ খুললো সে।

"আচ্ছা, যাবো না। পাখার বাতাস বন্ধ করো আগে। আমি আর ওতো ছোট্টটি নই।" শেষের কথাটায় জোর দিলো বেশি। "কিভাবে বের করবো সেটা বলো আগে।"

"ঘড়ি নে একটা।" ফুঁপিমা বললেন। চাচার পকেট ঘড়িটা যেন কোথা থেকে উড়ে এলো। সবাই জানার জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেখেছে। দাদাও আড় চোখে তাঁকাচ্ছেন। তার প্রিয় মেয়ে বলে কথা। কি হলো আজ? ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ বেশি বেশি মনে হচ্ছে।

"কান খাঁড়া কর।" ফুঁপিমা বললেন। কাগজ পেন্সিল এগিয়ে দিলেন সামনে। "ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে দাগ দিবি কাগজে। এক ডাকে এক দাগ।"

"বাপ্ রে! এতো অনেক তাড়াতাড়ি ডাকে। মনে হয় সেকেন্ডেই কয়েকবার।" চাচী বললেন এবার। আসলেই তো। সবাই দেখি আঙ্গুলেই গোণা শুরু করে দিয়েছে।

ফুঁপিমা হাসলেন। অন্ধকারেও গালে টোল দেখা গেলো মনে হচ্ছে। বললেন, "১৫ সেকেন্ডে কতবার ডাক দিলো সেটা জানলেই চলবে আমাদের।"

আগের সব দাগ কেঁটে দিলো রকিব। ঘড়ি ধরে নতুন করে দাগ দেয়া শুরু করলো সে। অন্যরাও আঙ্গুলে নতুন করে যোগ করতে শুরু করলো। ১৫ সেকেন্ড কম সময় নয়।

৫১, ৫১ বার! দুবার লাফ দিলো ইমতিয়াজ। ছোট্ট রকিবের চাচাতো ভাই। এরমধ্যে দাগগুলো যোগ হয়ে গিয়েছে রকিবেরও। ঠিক ৫১টা দাগ। ১৫ সেকেন্ডে। রকিব ভাবছিলো, চ্যাঁচাতেও পারে ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো! সেকেন্ডেই কয়েকবার করে ডেকে ফেলছে তারা। পাগল করে দেবে মনে হচ্ছে।

হাসলেন ফুঁপিমা। বললেন "৯ যোগ করে সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ দে। ৫১+৯ হচ্ছে ৬০। সেটাকে ২ দিয়ে ভাগ দে। সেটাই এখনকার টেম্পারেচার। ৩০ ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেড।" বাকিটা শোনার ধৈর্য্য রইলো না কারো। বাচ্চারা দৌড় দিলো দাদার স্টাডিতে। দৌঁড়াতে গিয়ে উল্টে দিলো একটা হ্যাজাক লাইট। শেষমেশ টর্চই সই। চার পাঁচটা লাইট পড়লো থার্মোমিটারে। এতো স্পটলাইট জীবনে পায়নি এই জিনিস। চেয়ার টেনে নিলো বাচ্চাদের দুজন। সবার চোখ কপালে। একেবারে ৩০ ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেড। কমও নয় বেশিও নয়। একদম কাঁটায় কাঁটায়। কিভাবে সম্ভব?